কেশবচন্দ্র।

কেশবচন্দ্র *।

ঐ যে সম্মুখস্থ প্রাচীরের উপরে একটি শৈবালের রেখা দেখা যাইতেছে, উহা ঐ প্রাচীরে উদ্ভিন্ন হইবার শত সহস্র বর্ষ হইতে সম্ভাবনারূপে রূপান্তরে বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞানবিদ্গণ চিন্তা ও যুক্তি দ্বারা যে তত্ত্ব আজ প্রকাশ করিলেন, কত কাল হইল, কত সহস্র কোটি বর্ষ হইল তাহার বীজ জগতে নিহিত ছিল। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে ভূত কালের সহস্র সহস্র বৎসর ও আগামী শত সহস্র বৎসরের সঙ্গে বর্ত্তমানের মহান্ যোগ বিদ্যমান। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি উদ্ভিজ্জগৎ, কি প্রাণিরাজ্য, কি উচ্চতম জীবজগৎ, ইহার কোনটিই সামান্য বলিয়া প্রতীত হয় না। বর্ত্তমান কালের রীতি নীতি, বর্ত্তমান কালের জ্ঞান ধর্ম্ম যে অনন্ত কাল হইতে নিখিল জীবমণ্ডলীর সহিত নিত্য যোগে আবদ্ধ, কে তাহা অস্বীকার করিবে? পূর্ব্বকালের সহিত বর্ত্তমান যুগের সম্বন্ধ রহিয়াছে; বর্ত্তমান যুগের সহিত অনন্ত ভবিষ্যৎ সংযুক্ত রহিয়াছে। কোন এক জন মানুষ এই সম্বন্ধবিহীন হইয়া এখানে আইসে নাই। একটি অতি সামান্য বিষয়েরও সহিত কোটি কোটি বর্ষের সম্বন্ধ। অদ্যকার আলোচিত বিষয়ের সহিত কাহার কাহার যোগ রহিয়াছে? কে বলিবেন

* ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সার।

রাজা রামমোহনের সঙ্গে যোগ। রামমোহনের সঙ্গে আবার আর এক জনের যোগ আছে, যিনি এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত ও গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ। ঋষি আত্মা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগী ঋষিদের সম্বন্ধ. যোগী ঋষিদের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সাধুদিগের ও বিদেশীয় সা দিগের সম্বন্ধ। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এ যোগ যিনি অ করিলেন, তিনি বিজ্ঞানের মস্তকে কুঠারাঘাত করিলেন, দর্শনের অস্তিত্ব বিনাশ করিলেন। শিশু আজ জন্ম গ্রহণ করিল, তাহার আসিবার পূর্ব্বে কোটি কোটি বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। সে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে এজন্য বায়ু নিরন্তর বহমান, তাহাকে আত্মক্রোড়ে আশ্রয় দিবার জন্য বিস্তীর্ণ জনসমাজ বর্ত্তমান, কত সহস্র সহস্র বৎসর হইতে উদ্ভূত কত জ্ঞান কত উন্নতি তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া অবস্থিত। মানুষ সহজে অকৃতজ্ঞ হয়। সে জানে না, তাহার জীবনের সঙ্গে কোটি কোটি জীবনের কি প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কি প্রকার দশা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আজ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সম্প্রতি আমাদের এক জন বন্ধু একটী বালিকাকে দূরদেশ হইতে আনিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র বালিকাটী শৈশবে ভল্লুক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল, ভল্লুকের গর্ত্তে বাস করিয়া ভল্লুকসদৃশ চীৎকার করিতে শিখিয়াছে, হস্তপদাদি সঞ্চালনে অপটু হইয়াছে, আজও তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, রসনার দোষ অপনীত হইল না। যদিও তাহার ঈদৃশ অবস্থা ঘটি-

আছে, তথাপি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গেও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ, তাহার জীবনের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ। মানুষ যদি এ সম্বন্ধ অস্বীকার করে, তাহা হইলে জনসমাজের সঙ্গে আপনার জীবনের সম্বন্ধ সে দেখিতে পায় না, দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, চিন্তাশক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

অতীত সহস্র সহস্র বর্ষের শাস্ত্র ও ইতিহাস হইতে প্রবাহক্রমে জ্ঞানাদি যদি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট না হইত, তাহা হইলে আজ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের নয়নগোচর হইত না। পূর্ব্ব কালের সহিত যোগ কাটিয়া ফেলিয়া যাহা উদিত হয়, তাহা অতীত সহস্র সহস্র বর্ষের ফল কি প্রকারে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে? পূর্ব্ব কালের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের আদি রাজা রামমোহনের কথা বলিতে হয়। ধর্ম্মপিতামহ রামমোহনের সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের অভেদ্য সম্বন্ধ। রামমোহনের ধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্যের পদবী অনুসরণ করিল, শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী হইল। শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের হৃদয়োদ্ভূত বেদান্তের অনুসরণ করিলেন; বেদান্ত গ্রহণ করিতে গিয়া রামমোহন শঙ্করের অনুসরণ করিলেন; সুতরাং বেদান্ত ত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে ত্যাগ করিয়া রামমোহনকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কে না জানে যে, রামমোহন শঙ্করকৃত বেদান্তভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন? কালক্রমে বেদান্তচর্চ্চা এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বঙ্গদেশকে বেদান্তের সহিত পরিচিত রামমোহন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের

পূর্ব্ববর্ত্তী বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আর্য্য ঋষির অনুসরণ করিয়া তিনি বেদান্তভাষ্য প্রচার করিলেন, উপনিষৎসমূহকে উদ্ধার করিলেন। রাজা রামমোহন তাঁহার অনুসরণ করিলেন বলিয়া তাঁহার মহত্ত্ব অণুমাত্র বিলুপ্ত হইতেছে না। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কাহারও নূতন সত্য গ্রহণে সামর্থ্য নাই। কোন একখানি পাশ্চাত্য গ্রন্থে লিখিত আছে, যে কোন ব্যক্তি পুরাতনের মূলোচ্ছেদ করিয়া নূতন কিছু সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে, সে একান্ত বঞ্চক। ভূতকালের ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ-চ্ছেদ করিয়া নূতন ধর্ম্মসংস্থাপনে যত্ন পত্তনহীন অট্টালিকাসদৃশ কোন কালে সফল হয় না।

জনসমাজে যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমুদায় কখন ঈশ্বরক্রিয়াবর্জ্জিত নহে। যে মহাশক্তির লীলা নিরন্তর জগতের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, যে চিন্ময় পুরুষের পদতলে কত রত্নরাজি নিহিত আছে, তৎপ্রতি চক্ষু নিমীলন করিয়া থাকা অসম্ভব। এই চিন্ময় শক্তির ক্রিয়াতে জগতে বিবিধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, পুরাতন হইতে নূতনের সমাগম হইয়াছে। পুরাতন আর পুরাতন থাকে না, তখন নূতন হয়। অবিনাশী চিন্ময় পুরুষের সাক্ষাৎক্রিয়াতে নূতনের সমাগম; সুতরাং রামমোহন শঙ্করাচার্য্যের অনুসরণ করিয়াও শঙ্করাচার্য্য হইতে স্বতন্ত্র হইলেন। রামমোহন এক দিকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, অপর দিকে তাঁহাতে সগুণ ভাবও বর্ত্তমান ছিল। জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকরূপে তিনি ঈশ্বরকে গ্রহণ করিলেন: সত্তা-

মাত্র নির্ব্বিশেষ এক অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মের আবির্ভাব বেদান্ত দেখাইলেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত হইতে ঈদৃশ ব্রহ্ম গ্রহণ করিলেন। জনসমাজ হইতে কিছুরই লোপ হয় না; তাই পরব্রহ্ম সত্তা মাত্রে জ্ঞেয়, স্বরূপবিচারে অনির্ব্বচনীয়, রাজা রামমোহন এই মত স্বীকার করিয়াও জগতের নির্ব্বাহকরূপে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইলেও সেই আদিকারণ,—যিনি জগতের কার্য্য করিতেছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য তারকাদির নিয়ন্তৃরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন,—রামমোহন তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পাকতঃ সগুণপক্ষ আশ্রয় করিলেন। ব্রহ্মের তত্ত্বচিন্তন কার্য্যদর্শন তাঁহার নিকটে প্রকৃষ্ট উপাসনা। সন্তোষসাধনের চেষ্টা, বা লৌকিক অনুষ্ঠান তাঁহার চক্ষে অতি নিকৃষ্ট। উপাসনা দ্বারা কে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে? সুতরাং তুষ্টি নহে, কিন্তু অনন্তের ধ্যান, চিন্তা ও মনন তাঁহার উপাসনা।

পরোক্ষ জ্ঞানই রাজা রামমোহনের সময়ে প্রধান ছিল। তিনি আত্মসাক্ষাৎকারকে অপরোক্ষ জ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগৎ মিথ্যা হইয়া গিয়া কেবল সত্তামাত্রে স্থিতি আত্মসাক্ষাৎকার। ব্রহ্মেতে জগৎ বিলীন হইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়মের' স্থিতি অনুভূত হইলে সকলই মায়া বলিয়া প্রতীত হয়। এইখানে রামমোহনের মায়াবাদীর সঙ্গে মিলন হইল, সকলই চলিয়া গেল, এক সত্তামাত্র থাকিল। শঙ্করাচার্য্য জগৎকে উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু রামমোহন জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াও এই স্থির করিলেন, যত দিন লৌকিক ব্যবহারে

কার্য্যময় জগৎ বর্ত্তমান, তত দিন ইহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; তন্মধ্যে ব্রহ্মের বিচিত্র কার্য্যনির্ব্বাহকত্ব অনুভব করিতে হইবে, চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে যে উপকার হয়, তাহা ঈশ্বরাধীন চিন্তা করিতে হইবে। এই এক কথাতেই শঙ্করের সহিত তাঁহার মিলের সঙ্গে সঙ্গে নূতনের আবির্ভাব হইল। এই নূতনের আবির্ভাব হইতেই সার্ব্বভৌমিক মত সংস্থাপিত হইল। যাঁহা হইতে সকলের উৎপত্তি, যাঁহাতে সকলের স্থিতি, অন্তে যাঁহাতে সকলে মিলিত হইবে, তাঁহাকে কে না স্বীকার করে? জগতের জন্য জনসমাজের জন্য যাহা হইতেছে তাহার উৎপত্তি সেই এক আদিকারণ হইতে। জনসমাজ কোন না কোন আকারে তাঁহাকে স্বীকার করে, তাঁহাকে অনুসরণ করে; অতএব আমাদের সঙ্গে সকল জাতির সেই একেতে যোগ। চীনদেশ-বাসী, তাতার দেশবাসী, সমগ্র পৃথিবীর মানবের সঙ্গে ঈশ্বরো-পাসনায় আমরা এক।

এ কথা জানা উচিত, তখনকার উপাসনা এখনকার মত ছিল না, অন্য রূপ ছিল।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিবিশন্তি"

এই মূল তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ওঁ তৎসৎ—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য, এই দুইটি বাক্য একত্র বা পৃথক্ গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা হইত। ইন্দ্রিয়সংযম, প্রণব ও পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ক

শাস্ত্র চিন্তন, এই উপাসনার অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু এখন আমরা যাহাকে উপাসনা বলি তখন তাহা ছিল না সত্য, কিন্তু না থাকিলেও ইহা তাহারই ফল বলিতে হইবে। এই একের নামে সকলে এক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল, সার্ব্বভৌমিকত্ব স্থান পাইল। রামমোহন সমগ্র মানবজাতিকে এই একেতে এক দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বদেশীয়গণকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিলেন, বিদেশীয়গণকে প্রিয় জ্ঞান করিলেন, যাহারা কুসংস্কারী, যাহারা পৌত্তলিক তাহাদিগকে করুণার চক্ষে দেখিলেন। স্বদেশীয় ভাই, বিদেশীয় প্রিয়, পৌত্তলিক করুণার পাত্র, এই তিন প্রকারে তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানবগণকে আত্মীয়তা-সূত্রে ভ্রাতৃত্বসূত্রে বান্ধিলেন। যাহারা কুসংস্কারী পৌত্তলিক তাহাদের অবস্থা দেখিলে দয়া হয়, ঘৃণা সেখানে আসে না। যদি আমাদিগের সহোদর বা পুত্র ভ্রষ্টাচার হয়, আমরা তাহাকে পর বিবেচনা করি না, তাহাকে ঘৃণা করি না, সন্তানের মত আমরা তৎপ্রতি দয়া করিয়া থাকি; সুতরাং রামমোহন বিপথগামীর প্রতি করুণা স্থাপন করিলেন। এক উপাসনা হইতে, এক প্রতিজ্ঞার বল হইতে রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরুত্থাপন করিলেন, বিলুপ্তপ্রায় বেদান্ত এ দেশে আনয়ন করিয়া সংস্থাপন করিলেন, শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা সত্য নির্ণয় করিলেন। ঋষিদের অনুসরণপূর্ব্বক তর্কযুক্তি দ্বারা বাদিগণকে পরাজিত করিয়া অসাধারণ ধীশক্তিযোগে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্য পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। উপাসনাগৃহ

প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তিনি এ দেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশে গমন করিলেন। তাঁহার যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বন্ধুবর্গ শিথিলযত্ন হইয়া পড়িলেন, ব্রাহ্মসমাজ ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন হইল।

ঋষি আত্মা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ জীবিত আছেন। আমরা আমাদিগের কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে অর্পণ করি। রাজা যাহা করিয়া গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে দৃঢ়মূল করিলেন। রামমোহন ব্রহ্মকে পরোক্ষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ অপরোক্ষ ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার পথ পরিষ্কার করিলেন। যাহা প্রথমে জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল, আমাদিগের ধর্ম্মপিতা তাহাতে হৃদয় সংযোজিত করিয়া উহাকে মধুময় করিলেন। তিনি যদি হিমালয়ের নিভৃত স্থানে যোগেতে ভক্তিতে ব্রহ্মকে আত্মস্থ না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের আজ এরূপ অবস্থা কখন আমরা দেখিতে পাইতাম না। আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় যোগযুক্ত হইয়া হৃদয়ে ব্রহ্মকে ধারণ করা, এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহারই নিকট ঋণী। পরব্রহ্মে কি প্রকারে বাস করা সম্ভবপর, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেখাইলেন। রাজা দেখাইলেন সার্ব্বভৌমিকত্ব, মহর্ষি প্রকাশ করিলেন বিশেষত্ব। এই দুইটি ভাবকে ইংরাজিতে Universal এবং Particular বলে *। চিত্ত যখন সার্ব্বভৌমিকের উপরে স্থাপিত হয়, তখন যাহা কিছু বিশেষ

* সংস্কৃত ভাষাতে 'নির্ব্বিশেষ এবং 'সবিশেষ' এই দুইটি সংজ্ঞা প্রচলিত। 'সার্ব্বভৌমিক' ও 'বিশেষ' এ দুই সংজ্ঞা অতি বিষদ বলিয়া বক্তৃতায় উহাই গৃহীত হইয়াছে।

তাহা আমাদিগের চক্ষুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, অথবা তাহা মিথ্যারূপে প্রতীত হয়। পরব্রহ্মের ধারণা এই সার্ব্বভৌমিক ভাবের উপরে নির্ভর করে। রাজা রামমোহন আত্মসাক্ষাৎকারের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই সার্ব্বভৌমিকত্ব তাঁহার চক্ষুঃসন্নিধানে যে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সার্ব্বভৌমিক ভূমিতে তাঁহার চিত্ত স্থাপিত হওয়াতেই তিনি এক ব্রহ্মেতে সমুদায় মানবজাতিকে একত্বে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমিক ভূমির উপরে যদিও ব্রহ্মযোগ প্রতিষ্ঠিত, তথাপি 'বিশেষের' সহিত উহার সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া সার্ব্বভৌমিক গ্রহণ করিতে পারা যায় না। বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে বলিয়াই সার্ব্বভৌমিক ব্রহ্ম আমাদিগের জ্ঞানগোচর হন। ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে ভাবুক হইয়া সকল দেশ সকল কাল গ্রহণ করিলেন না; তিনি এ দেশীয় বেদান্তবাদী ঋষিগণকে গ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মে যোগযুক্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভারতের ঋষিগণের সহিত বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া তিনি সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে কেন আপনাকে আবদ্ধ করিলেন? ইহার বিশেষ কারণ আছে। মহর্ষির প্রতি আদেশ হইল, 'তুমি ধর্ম্মকে পরিপক্ক কর'। সাধনের সময় মনোরথযোগে সুদূর গমন করিলে সাধন সিদ্ধ হয় না। নিকটস্থ বন্ধুদিগকে ভাল বাসিতে না পারিলে মানবজাতিকে ভালবাসা যায় না। প্রতিনিয়ত যাহাদিগের সহিত দেখা হইতেছে, তাহাদিগকে

আপনার না করিলে সমগ্র পৃথিবী আপনার হয় না। তাই মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ কেবল ঋষিগণকে গ্রহণ করিয়া বিধান-সংযুক্ত মহাজনগণকে পরিহার করিলেন। চৈতন্যকে বলিলেন, যাও চৈতন্য, তুমি অজ্ঞান মূর্খগণের মধ্যে গিয়া রাজত্ব কর। খ্রীষ্ট, তুমি পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রক্ষা করিতে চাহি না। তিনি এই বলিয়া আর সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋষিদিগকে আপনার করিয়া লইলেন। তাঁহাদিগের 'নেতি নেতি' বাক্য ইনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া হিরণ্ময় কোষে ঈশ্বর দর্শন করিলেন, পরমাত্মাকে আত্মস্থ করিলেন। ব্যাপক ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি সঙ্কীর্ণ ভূমিতে আপনাকে বদ্ধ করিলেন, ইহা বলিয়া যদি কেহ তাঁহার নিন্দা করে তাহা হইলে ভগবানের নিন্দা হয়। তিনি এ সম্বন্ধে ভগবানের আদেশ পালন করিলেন, কেহ তাঁহাকে এ বিষয়ে নিন্দা করিও না। যাহা তাঁহার করিবার ছিল তাহা করিয়া সমগ্র মানবসমাজকে তিনি ঋণী করিলেন। এ সময়ে যে ব্রহ্মদর্শন প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, ইহা মহর্ষির কৃপায়। রাজারামমোহন এক দিকে বেদান্ত অপর দিকে বাইবেল গ্রহণ করিয়া ঋষি ও খ্রীষ্ট উভয়কে সমভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট উদারতার পরিচয় দান করিয়াছেন, মহর্ষি খ্রীষ্টকে বিদায় করিয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছেন এ কথা যেন মনে না হয়। বিশেষ ভূমিতে শিক্ষা লাভ না করিয়া একেবারে সার্ব্বভৌমিকে উপস্থিত হইতে গেলে ধর্ম্ম

পরিপক্কতা লাভ করে না। নিকটস্থ ব্যক্তিগণকে যে ভাল বাসে না, সে যদি বলে আমি সমুদায় পৃথিবীর লোককে ভালবাসি তাহা হইলে সে তদ্দ্বারা আত্মবঞ্চনা করে। যে ব্যক্তি আপনার মধ্যে পরব্রহ্মের দর্শন পাইল না সে সমগ্র জগতে তাঁহাকে কি প্রকারে দর্শন করিবে? যে স্বদেশকে আপনার করিতে পারিল না, সে সমগ্র পৃথিবীকে আপনার করিবে কি প্রকারে? অগ্রে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলে ব্রহ্মদর্শন হয়, পরিশেষে উহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। মানবের প্রতি প্রীতিসম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই জন্যই ঋষি দেবেন্দ্রনাথ অগ্রে হিরণ্ময়কোষে ব্রহ্মকে দেখিলেন, পরিশেষে গিরিগুহায়, চন্দ্রতারকাদির মধ্যে তাঁহার দর্শন পাইলেন। অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শনবিষয়ে তিনি সিদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বদেশীয় যোগিগণকে লইলেন, বিদেশীয় সাধুদিগের সঙ্গে মিলিত হইলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি আপনার বিশেষ নিয়োগ অতিক্রম করিলেন না, সুতরাং তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার চিরকাল প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মসমাজে যাহা লাভ হইয়াছে, যাহা লইয়া আমরা বর্ত্তমান ভূমিতে উপস্থিত, তাহা তাঁহার কৃপায়। ভগবানের নিকট তাঁহার জন্য আমাদিগের প্রার্থনা করিবার অধিকার নাই, তিনিই নিয়ত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাঁহার প্রতি অণুমাত্র অসদ্ভাব পোষণ করিতে পারি না। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমাদিগের সম্বন্ধে মহান্ অপরাধ। মতসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু নববিধানের লোকের বিচারকের আসনে বসিবার

অধিকার নাই। উপকার স্বীকার করা তাঁহাদিগের কার্য্য। তাঁহারা তাঁহার নিকট যাহা পাইয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবেন। পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিয়া তিনি আমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারী করিলেন, আমরা এখন সুখে সেই রাজ্যে বসতি করিতেছি।

তৃতীয় ব্যক্তি কি করিলেন? তিনি কি করিলেন, আমরা তদ্বিষয়ে সকলেই সাক্ষী। যাঁহার জীবনের সঙ্গে এই জীবনের অভেদ্য যোগ, তাঁহার কথা মুখে অধিক বলিতে পারিও না, বলা ভালও দেখায় না। বাহিরের লোক কেশবচন্দ্রকে প্রশংসা করিতেছে, এসিয়া ইউরোপ তাঁহাকে সম্মান দিতেছে, কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিবার জন্য সমুদয় পৃথিবী লালায়িত, তাঁহার বন্ধুগণের পক্ষে ইহা একান্ত হর্ষবর্দ্ধন। তিনি সমুদায় লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হউন, ইহার তুল্য আর তাঁহাদের আহ্লাদের বিষয় কি আছে? ভগবৎকৃপায় তিনি যথাযথ সকলের কর্ত্তৃক গৃহীত হউন। তাঁহাকে যথাযথ গ্রহণ করিবার পক্ষে সাহায্য করিবার জন্য এই যত্ন। মনে হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষকে কেহ ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে না। অল্প দিন হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ মানুষকে পরব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেখা পড়া শিখিয়া বিদ্বান্ হইলেই কেহ পূর্ব্ব সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হয়েন না। কেশবচন্দ্রের জীবন এই অসৎ সংস্কারের প্রতিবাদ স্বরূপ। তাঁহার যত্ন চেষ্টা এক পরব্রহ্ম সহ সমুদায়

মানবকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অভেদ্যযোগে বদ্ধ করিবার জন্য। সে চেষ্টায় তিনি অনেক হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, এ দেশ ও দেশ সকল দেশের লোকের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি হাসি, যখন কেহ বলে আমার শত্রু আছে। এরূপ বলিবার অর্থ এই, তিনি যে সত্য প্রদান করিয়াছেন, যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলে তাহারাও তদ্দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কেশবচন্দ্রের প্রধান লক্ষণ আমিত্ব-বিনাশ। তিনি তাঁহার বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন, অনেক দিন হইল আমিরূপ পাখী এই দেহ হইতে উড়িয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে জানি না, কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিবার নহে। এই আমিত্ব উড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন, আমাকে গ্রহণ করিলেই আমার দ্বারা ভগবান্ যে সত্য প্রচার করিতেছেন তাহা গ্রহণ করা হয়, আমি আর এই সত্য ভিন্ন নহি। এই সত্য হইতে আমি এক জন যদি স্বতন্ত্র থাকিতাম, শত্রুতার অভ্যুদয় হইত।

তিনি এই আমিত্বকে কি প্রকারে বিদায় করিয়া দিয়াছেন, ইহা সকলেরই অবগত হওয়া প্রয়োজন। ঈশ্বর ভিন্ন পার্থিব কোন বিষয়ে আবদ্ধ হইলে আমিত্ব সেই বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকে। তাই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের অভ্যুদয়ে আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই, 'কোথাও কোন সম্প্রদায়ে আমি মিশি নাই, কোন ধর্ম্মমত গ্রহণ করি নাই, এক কালে সকল হইতে বিরত ছিলাম। কি গ্রহণ করিব, কি ত্যাগ করিব, কোন্

গ্রন্থ পাঠ করিব, ভগবান্ তাহা বলিয়া দিতেন। সর্ব্বদা ভয় হইত কোথায় কাহাতে আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইব, সঙ্কীর্ণ ভূমিতে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ডুবিয়া মরিব! কোন গুরুর নিকট গেলাম না, ভয় হয় পাছে মানুষকে গুরু বলিয়া আশ্রয় করিয়া ভগবান্‌কে হারাই। কোন সম্প্রদায়ের দাস হই নাই। সকল কথা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তিনি আমার গুরু ছিলেন, শাস্ত্র ছিলেন, যে কোন কার্য্য তাঁহার অভিপ্রায় না লইয়া করিতাম না। নির্জ্জনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, যেমন প্রার্থনা করিলাম তেমনি আদায় করিলাম।' ভগবানের নিদেশ না পাইয়া যখন তিনি কোন কার্য্য করিতেন না, তখনই তাঁহার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল। তিনি এইরূপে যখন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইলেন, তখন অপরকেও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্পণ করিলেন। দাস তাঁহার কেহ ছিল না। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অনুগামী হইল, অথচ দাস কেহ হইল না। একদা সিমলা শৈলে কোন বন্ধু তাঁহাকে বলেন, শিক্ষিতসমাজ আপনাকে গ্রহণ করিল না, চলুন পল্লিগ্রামে যাই, সহস্র সহস্র লোক আদরের সহিত আপনাকে গ্রহণ করিবে। তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার ধর্ম্ম লোকে গ্রহণ করিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এক জন মৌলবি আসিয়াছিলেন। তিনি জলপড়া দিয়া লোককে আরোগ্য করেন, এই জনরবে এমনি জনতা হইল যে, মৌলবীর ফুৎকারের জন্য শত সহস্র লোক পথ ঘাট আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। বাল্যকালে কেশবচন্দ্র ভেল্কী দেখাইয়া সকলকে

ধর্ম্মিত করিয়াছিলেন, তিনি মনে করিলে ভেল্কী দেখাইয়া লোককে মুগ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'ঈদৃশ কার্য্য করা আমার প্রতি নিষেধ। আজ যদি আমি মস্তক মুণ্ডন করিয়া শূন্য পদে দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হই, সহস্র সহস্র লোক আমার অনুবর্ত্তন করিবে, কিন্তু এরূপ কার্য্য আমি কখন করিব না।' বস্তুতঃ স্বাধীন ভাবে তিনি ধর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবানের নিকট সমুদয় জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্ম স্থির করিলেন। তিনি অন্যের নিকট কিছু ধার করিয়া লইয়া জীবন আরম্ভ করেন নাই, যে কিছু আত্মসম্বল ছিল তাহা লইয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছেন এবং ক্রমে উহাকে বাড়াইয়াছেন। ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিতে হইলে তোমার আমার এই রূপ করা সমুচিত।

তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ দর্শন সম্ভব, অপরের জীবনে নহে, এ বিশ্বাস কেশবচন্দ্রের ছিল না। দর্শনের মূল ভূমি কোথায়? আত্মাতে। সুতরাং আত্মাতে পরমাত্মাকে লইয়া তাঁহার জীবনের আরম্ভ। আরম্ভে তাঁহার সম্পত্তি অল্প ছিল, ক্রমে তিনি তাহা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এখন তাঁহার সম্পত্তি কে গণনা করিতে পারে? যে ভূমির উপরে তাঁহার জীবনের আরম্ভ, সে ভূমি কি? রামমোহনের সার্ব্বভৌমিকত্ব, দেবেন্দ্র নাথের বিশেষত্ব। সার্ব্বভৌমিকত্ব এবং বিশেষত্ব, এ দুয়ের সম্মিলনে কেশবজীবন গঠিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে এক জন পিতামহ, আর এক জন পিতা, দুই জনের ভাব কেশবচন্দ্রে একীভূত হইল, উভয়ের ভাব মিলি

হইয়া ইঁহার জীবন সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিল। সার্ব্বভৌমিক চিরদিন বিশেষের মধ্য দিয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করে। বিশেষ ছাড়া সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানের অগোচর, সর্ব্বথা বন্ধ্য। প্রারম্ভে কেশবচন্দ্রে এই দুই ভাবের মূল কোথায় ছিল? ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণে। এই দর্শন ও শ্রবণ হইতে পরে নববিধান আসিলেন। এই সূক্ষ্ম মূলোপরি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। যাহা কিছু নিগূঢ় ছিল, এই দর্শন শ্রবণ হইতে সমুপস্থিত হইল। যখন ঈশ্বরের নিকট তিনি যাইতেন, উত্তর লইয়া তবে ফিরিতেন। কেবল ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি স্থির থাকিতেন না, উত্তর পাইয়া তবে স্থির হইতেন। প্রথমেই কোন একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ দেবতাকে আশ্রয় না করিয়া তিনি সার্ব্বভৌমিক দেবতাকে অধিকার করিয়া জীবন আরম্ভ করিলেন; সুতরাং তাঁহা কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমিকত্ব অধিকৃত হইল। রাজা রামমোহন যে সার্ব্বভৌমিক দেবতাকে স্থাপন করিলেন, কেশব চন্দ্র আত্মপ্রকৃতির প্রেরণায় তাঁহাকে অধিকার করিলেন। কেশবচন্দ্র পরব্রহ্মকে কোন শাস্ত্র হইতে বা আচার্য্যগণের উপদেশ হইতে গ্রহণ করিলেন না। কোন শাস্ত্রপ্রবচন তাঁহার পথ প্রদর্শক হইল না। পিতামহ রামমোহন শাস্ত্রবচন অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মপূজা প্রচলিত করিলেন, শাস্ত্রানুসরণ করিয়া চলাই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট স্থির করিলেন। কেশবচন্দ্র যদি এরূপ করিতেন, শাস্ত্রবিশেষে ধর্ম্ম অবরুদ্ধ হইত, সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িত। ঈশ্বর দর্শন ও শ্রবণ যদি তিনি আপানার ধর্ম্মের মূল করিয়া না

লইতেন, তাহা হইলে তিনি পরে যে কার্য্য করিলেন তাহা কখন উপস্থিত হইতে পারিত না।

এখন দেখা যাউক, কেশবচন্দ্রে সার্ব্বভৌমিকত্ব ও বিশেষত্বের মিলনে কি হইল? সার্ব্বভৌমিকত্বে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইল। সার্ব্বভৌমিকত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত্ব তাঁহার অভ্যন্তরে উদ্ভিন্ন হইয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন ঘটিল। সার্ব্বভৌমিককে বিশেষের মধ্যে দেখা কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব। ব্রহ্মকে কেবল সার্ব্বভৌমিক ভাবে দর্শন করিলে নিগুর্ণবাদী হইতে হয়, সমুদয় জগৎ ও জীব মিথ্যা হইয়া চিদাকাশে মিশিয়া যায়, শুষ্কজ্ঞানমাত্র অবশেষ থাকে। সার্ব্বভৌমিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশেষ ভাব লইলে কুসংস্কার আসে, পৌত্তলিকতা আসে। তাঁহাতে সার্ব্বভৌমিক ও বিশেষ উভয়ের মিলন হওয়াতে তিনি এক দিকে শুষ্ক জ্ঞানের পথ দূরে পরিহার করিলেন, অন্য দিকে তাঁহাতে কোন প্রকার কুসংস্কার স্থান পাইল না। সার্ব্বভৌমিককে বিশেষের মধ্যে দেখিতে গিয়া অবতারবাদ আইসে, কিন্তু সার্ব্বভৌমিককে দৃষ্টির অন্তরাল না করিলে অবতারবাদের দোষ আইসে না, কেন না যদি অবতার মানিতে হয়, তাহা হইলে ইহাতে এক জন মানবেতে অবতরণ না দেখিয়া সকল মানবেতেই সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ দৃষ্ট হন। কেশবচন্দ্রের ভিতরে এই সার্ব্বভৌমিক ভাব থাকাতেই তিনি খ্রীষ্টীয় সমাজে যোগ দিলেন না, বৌদ্ধ মন্দিরে যাইলেন না, কোন সংকীর্ণ ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না, অথচ তিনি সার্ব্বভৌমিক ব্রহ্মের

ভিতর দিয়া সমুদায় বিশেষ বিধান অন্তরস্থ করিলেন, সে সমুদায়কে ব্রহ্মেতে এক সূত্রে গাঁথিলেন। সুতরাং সার্ব্বভৌমিক ও বিশেষ তাঁহাতে সমঞ্জসভাবে একত্র স্থিতি করিল।

পাপবোধ তাঁহার গভীর ছিল। তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ বলেন, তাঁহার জীবন নির্দ্দোষ প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মত ছিল। গোলাপ ফুলের নিম্নে কাঁটা দিয়া বিধাতা যেমন উহাকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি ভগবান্ তাঁহার জীবন বিবেকবৈরাগ্যকণ্টকে আবৃত করিয়া সর্ব্বদা উহার শুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র বলিলেন, আমার জীবন নরকময়, শত সহস্র পাপ কীটের ন্যায় ভিতরে কিল্‌বিল্ করিতেছে। তাঁহার মত আমাদের পাপবোধ নয়, এই জন্য তিনি এক বার বলিয়াছিলেন, আমি কতকগুলি পাপী বন্ধু পাইলে অনেক কার্য্য করিতে পারিতাম। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে পাপী বলিয়া মনে করিতেন, অপরকে শ্রেষ্ঠত্বদানে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে কৃষ্ণদাসপাল প্রভৃতি নগরের গণ্য মান্য লোক অপেক্ষা তিনি আপনাকে নিকৃষ্ট মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে তাঁহারা আমা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কখন গবর্ণমেণ্টভবনে যাইতে হইলে সর্ব্বদা ইঁহাদের পশ্চাতে থাকিতে যত্ন করিতেন। লর্ড বেয়ারিং সাহেব তাঁহার এই ভাব জানিতেন। তিনি তাঁহাকে সকলের পশ্চাৎ হইতে লইয়া যাইয়া আদর ও অভ্যর্থনা করিতেন, বিশেষ আলাপ করিতেন।

তিনি বড় মানুষের ঘরের ছেলে হইয়াও গরিবের ন্যায় বাস করিতেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া যখন তিনি মহারাণীর নিকটে পর্য্যন্ত সম্মানিত হইলেন গৌরবান্বিত হইলেন, তখন কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন, এই বার তিনি তাঁহার ছিন্ন-বস্ত্রপরিধায়ী গরীব সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। কোন বন্ধু তাহার এই উত্তর দেন, তাহা হইলে তিনি আর কেশবচন্দ্র থাকিবেন না। যদিও পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহাকে কোন কোন স্থানে যাইতে হইত, তথাচ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যেন বাঁচিতেন ; পরিচ্ছদ কণ্টকের ন্যায় যেন যন্ত্রণা দিত। প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল গাড়ী অপেক্ষা তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করিয়া নিজেকে স্বস্থ মনে করিতেন। আহারের বিবিধ আয়োজন সত্ত্বে সে সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি শাকাদিতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। এইরূপ দীনতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে পাপী মনে করিতেন। সেণ্ট পল যেমন বলিয়াছিলেন, আমি পাপীর মধ্যে প্রধান, ইনিও সেইরূপ টাউন হলে যখন প্রকাশ্য বক্তৃতাতে নর-হত্যাদি মহাপাপে আপনাকে লিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তখন বিলাতের বয়সি সাহেব বলিয়াছিলেন, এ ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাঁহার জীবনে একটি পাপও দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি বলিলেন কি না, আমি নরহন্তা। বন্ধুগণ তাঁহাকে এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যদি আমার মনে হয়, এ ব্যক্তি সম্মুখে না আসিলে ছিল ভাল, তখনি আমি

আপনাকে নরহন্তা বলিয়া সাব্যস্ত করি। নিকট হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া ব্যতীত বধ আর কাহাকে বলে? অন্যান্য পাপ-সম্বন্ধেও তাঁহার এইরূপ সূক্ষ্ম বোধ ছিল। পাপ করিবার সম্ভাবনাই তাঁহার নিকটে পাপ। কেশবচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে আপ-নাকে পাপী বলিয়া স্থির করিলেন, অথচ এই পাপবোধ ব্রহ্ম দর্শনে অন্তরায় হইল না। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, তিনি পাপী হইয়াও যখন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, তখন কোন মনুষ্যেরই ব্রহ্মদর্শনে অনধিকার নাই, দর্শন ও শ্রবণ সকলেরই পক্ষে সম্ভব।

আপনাতে যাহা সম্ভব তাহা আর সকলেতে সম্ভব, এই নিশ্চয় হইতে তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ভাব প্রকাশ পাইতেছে। লোকে আপনার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অহঙ্কারী হইয়া পড়ে, অপর সকল ব্যক্তি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলে। সুতরাং সার্ব্বভৌমিক মত তাহারা মানে না। ঈশ্বরদর্শন হইতেছে না, এ কথা কেহ বলিলে তিনি বলিতেন, এক বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির ভাবে অবলোকন কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তাঁহার একটী ইংরাজী প্রার্থনায় লিখিত আছে, হে ঈশ্বর, ভাইয়েরা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উত্তর দিলেন, তুমি কি মধ্যবর্ত্তী? তিনি বলিলেন না, তাঁহারা আসেন না তাই আসিয়াছি। ঈশ্বরদর্শনে অন্যকে বঞ্চিত করা কি, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমুদয় জীবে, নরনারীতে এবং প্রকৃতিতে ব্রহ্মকে অবতীর্ণ দেখি-

গেল। এইখানে তাঁহার সার্ব্বভৌমিকত্ব। এইরূপে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অবতরণ দর্শনে অবতারবাদের দোষ চলিয়া গেল। তিনি আপনার এবং অপরের জীবনকে এক এক খানি বেদ বলিয়া মানিতেন। যত মানুষ তত বেদ। সুতরাং শাস্ত্র ও গুরুবাদ এইখানেই বিনষ্ট হইল। কোন এক শাস্ত্র বা কোন এক জন বিশেষ গুরু মানিতে হইলে তৎপ্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতে হয়, কিন্তু কেশবচন্দ্রের কাছে ইঁদুর, বিড়াল, নদ নদী প্রভৃতি সকলেই গুরু, সকলেই কথা কয়, সুতরাং গুরুবাদ ও শাস্ত্রবাদের দোষ অপনীত হইল। আর এই কথাতেই মধ্যবর্ত্তিবাদিত্বের মতও রূপান্তরিত হইয়া গেল। সার্ব্বভৌমিকত্বে গুরুবাদ, শাস্ত্রবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদ উড়াইয়া দিয়া আবার বিশেষত্বে তাহাদিগের পুনঃস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই বিশেষত্ব সার্ব্বভৌমিক ভাব পরিহার করিয়া গৃহীত হয় নাই বলিয়া সর্ব্বথা দোষশূন্য হইয়াছে। বিশেষ ও সার্ব্বভৌমি-কের ভিতর তিনি প্রমুক্ত ভাবে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেন বলিয়াই জাতির মধ্যবর্ত্তী ঈশা মুষা প্রভৃতির দলস্থ তিনি নন, এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তিনি জীবনবেদে অনৃতখণ্ডনে বলিয়াছেন, ঈশা মুষা প্রভৃতির সহিত এ ব্যক্তিকে যাঁহারা এক করেন, তাঁহারা মিথ্যাকথনদোষে দোষী হইলেন। তাঁহার কোথায়, তিনি স্পষ্ট করিয়া স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যপ্রকারে গ্রহণ করিলে বা গ্রহণ করাইলে তাঁহার কথা তাহার প্রতিবাদ করিবে এবং তাঁহারা সর্ব্বথা নারথ হইবেন।

সার্ব্বভৌমিক ও বিশেষে একত্বসংস্থাপনই কেশবচন্দ্র। সমুদায় জাতির ইতিহাস ও প্রকৃতির ভিতর এক ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সার্ব্বভৌমিক ভাব গ্রহণ করিতে গিয়া বিশেষত্ব ত্যাগ করিও না, কেন না তাহা হইলে কেবল শূন্যে উড়িতে থাকিবে। মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর অনন্ত অজ্ঞেয় পরব্রহ্মের ভাবে তিনি শূন্যে উড়িলেন না, কিন্তু সমুদায় শাস্ত্র সমুদায় ধর্ম্ম ও মানবজীবনের ভিতর দিয়া যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সাধু ও মহাজনগণের বিশেষত্বের দ্বার দিয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সকলকে লইয়া অনন্ত চিৎসাগরে ডুবিলেন। তাঁহার বিশেষ মত এই, আমি ও সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। এই মনুষ্যজাতির অভিন্নতাজ্ঞান হইতে নববিধানের উৎপত্তি, ব্রাহ্মসমাজে নূতন ভাবের সমাবেশ ; কালী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ খ্রীষ্টের একাধারে মিলন ; যোগও ভক্তির একত্ব। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ নূতন হইল। এত দিন সাধু মহাজনগণ পর ছিলেন, কাহারও নিকটে শঠ বলিয়া বিদিত ছিলেন, এ সব ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহা আর তিষ্ঠিতে পারিল না। বলিতে হয়, অক্ষয়কুমার দত্ত—যাঁহার নিকটে আমরা চিন্তা করিতে শিখিয়াছি, যিনি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের জন্মদান করিয়াছেন, । আজ্ঞে যাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেছেন—তিনি এই সর্ব্বনাশের ব্রাহ্মসমাজে এই অসত্য মত তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বলিলেন, রাজা রামমোহন সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধুকে প্রবঞ্চক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। রামমোহনকৃত তহফতে দিনের দোহাই দিয়া তিনি এই কথা প্রতিপন্ন ক'

করিয়াছেন, কিন্তু সে গ্রন্থ যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, দত্ত মহাশয় রামমোহনের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। তিনি শিব কৃষ্ণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতেও ভগবৎ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কখনও তাঁহাদিগকে বঞ্চক বা শঠ বলিয়া নিন্দা করেন নাই। তিনি সমুদায় শাস্ত্রকে এক প্রকার অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ঈশাকে গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী বলিলেন। ঈশা প্রার্থনা করিলে পাপীর পরিত্রাণ হয় খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, তিনিও তাহা বিশ্বাস করিলেন। এরূপ স্থলে তাঁহার প্রতি এরূপ দোষ দেওয়া অন্যায়। তখন সময় হয় নাই, তাই সমুদায় তত্ত্ব প্রকাশ হয় নাই, ... সময়ে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

...মোহন এবং দেবেন্দ্র নাথের মধ্যে যে দুই ভাব স্বতন্ত্র ...ল, তাহা কেশবচন্দ্রে একত্র হইল। ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টকে ...রিয়া দিলেন, চৈতন্যকে বিদায় করিয়া দিলেন, শাক্যের ...ন সম্বন্ধ রাখিলেন না। ইহার প্রতিবাদ করিয়া নব- ...আসিলেন। সার্ব্বভৌমিক ও তাহার বিলাসস্থল বিশেষ, ...ম্মিলিত হইল। সকলের ভিতরে এক জ্ঞান, সকলের ভিতরে ...কলের মধ্যে এক প্রাণ, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ...পিত হইল। পদ হইতে হস্ত ভিন্ন, কর্ণ হইতে চক্ষু ...ঃ এক প্রাণ বাহ্যিক সমুদায় দেহকে গঠন করিল, একত্র ...মনে করিও না, এই একত্বে ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইল। ...প্রাণশক্তিতে সংযুক্ত হইয়া দেহের যন্ত্র গুলির একটিকে

ছাড়িয়া আর একটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, অথচ প্রত্যেক যন্ত্রেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। উপরে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম, নিম্নে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মনুষ্য নববিধান ঘোষণা করিলেন। এক মানুষের ব্রহ্ম এক প্রাণ, কেশব চন্দ্র দুই মানুষ জানিতেন না। তুমি পর, তুমি আমার শত্রু, এ কথা মানিতে পারি না। তোমার ভিতর যিনি, আমার ভিতর তিনি, তুমি আমি এক। এক জনকে বাদ দিলে আমাকে বাদ দেওয়া হয়। এক ভিন্ন জানি না। যাহার ভিন্ন বোধ আছে, সে নববিধানবিরোধী হইল। শত্রু হউক বা মিত্র হউক, সে বিধানবিরোধী। এই জন্য যে ব্যক্তি নিরন্তর আমি আমি করিতেছে, সে অপরকে ঘৃণা করে। আমি ২৫ বৎসর সাধন করিতেছি, কাল যে আসিয়াছে, সঙ্গে আমি সমান? একথা সহজে তাহার মনে উঠে। যোগী, আমি ভক্তদিগের চরণতলে বসিয়া ভক্তি সাধন ক মহোৎসাহে কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকি, এইরূপ সকল সঙ্গে যাহার আমি আছে, সে আর যাহা হউক না কেন সত্য যে, সে আমি বিদায় দেয় নাই। কেশব চন্দ্রের এ ছিল না। তিনি আমিকে বিদায় দিলেন, ভগবানের শরণা লেন, শরণাপন্ন হইয়া সকলের সঙ্গে এক হইলেন। তি লেন, আমি একা কিছুই করিতে পারি না। আমি সঙ্গে অভিন্ন, সকলের সঙ্গে একীভূত। অহঙ্কারমূলক তিনি একেবারে বিসর্জ্জন দিলেন। সুতরাং মানবপক্ষে মেবাদ্বিতীয়ম্' তাঁহাতে সিদ্ধ হইল।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে, সকলে যদি এক হইল তাহা হইলে বিশেষত্ব রহিল কোথায়? শাক্যগ্রহণ, ঈশাগ্রহণ, চৈতন্যগ্রহণ, যোগ, হোম, গেরুয়া, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ইউক্যারিষ্ট, (সাধুশোণিতমাংসপানভোজন) ইত্যাদির সমাবেশই বিশেষত্ব। ভগবান্ এই সকল বিশেষের অভ্যন্তর দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। এখানে ভক্তিও আছে, যোগও আছে। সার্ব্বভৌমিক ও বিশেষের একত্বে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব হইল। কেবল বিশেষত্ব লইলে পৌত্তলিকতা আসিবে, কেবল সার্ব্বভৌমিকত্ব লইলে আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হইবে। সমুদায়ের মধ্যে এই দুই ভাবের মিলনই নববিধান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার্ব্বভৌমিক ছাড়া বিশেষ, বিশেষ ছাড়া সার্ব্বভৌমিক, এ উভয়ই মহৎ অনিষ্টের মূল। কেবল সার্ব্বভৌমিকে বিচরণ করিলে আত্মাতে, জনসমাজে বা প্রকৃতিতে ঈশ্বরের ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না, ইতিহাসে ঈশ্বরের লীলা উপলব্ধি হয় না, সমুদায় সৃষ্টি অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। কেবল বিশেষে বিচরণ করিলে দৃষ্টি সঙ্কুচিত হয়, সাম্প্রদায়িকতা বাড়িতে থাকে, নানাপ্রকার কুসংস্কারে চিত্ত আবদ্ধ হইয়া যায়। এ দুইয়ের একত্র সমাবেশ আজও পৃথিবীতে হয় নাই। উভয়ের একত্র সমাবেশেই নববিধানের মহত্ত্ব ও গৌরব।

কোন সময়ে কোন মহাপুরুষ স্বর্গকে স্বর্গরাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র বলিলেন (Kingdom of Heaven is not a kingdom but a *Republic*) স্বর্গরাজ্য—

মানবের দিক্ দিয়া দেখিলে—এক জন রাজা নয়, কিন্তু সকলেই রাজা। কে না জানে, এক রাজ্যে পাঁচ জন রাজা হইলে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হয়। পারস্যগ্রন্থ গোলেস্তায় লিখিত আছে, এক কম্বলে দশ জন ফকির শয়ন করিতে পারে, কিন্তু দুই জন রাজা—যদিও তাঁহাদের রাজ্যবিভাগের উপায় আছে—একরাজ্যে বাস করিতে পারেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন সকলের ইচ্ছা মিলিত হয়, তখন প্রত্যেকে নিয়ামক (Law unto himself) হন, তাঁহাকে নিয়মিত করিবার জন্য অন্য বিরুদ্ধ ইচ্ছা আর থাকে না। স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরের কথাশ্রবণ হইতে প্রত্যেকের ইচ্ছার নিয়ামকত্ব উপস্থিত হয়। সংসারের দাস যে, বন্ধুবান্ধবের মায়ায় আবদ্ধ যে, রিপু ও বাসনার অনুগামী যে, সে ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায় না। এই নিমিত্তই কেশবচন্দ্র কখন দাস হইলেন না, অন্যকেও দাস হইতে দিলেন না। তিনি সাধনের জন্য গেরুয়া গ্রহণ করিলেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পাছে বা সে সকলের দাস হইতে হয়, এই ভয়ে কখন বা গ্রহণ, কখন বা ত্যাগ করিলেন। মান সম্ভ্রম গৌরবাদিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িবার ভয়ে তিনি মান সম্ভ্রম গৌরবাদি দেখিলেই ভিতরে পলায়ন করিতেন। তিনি আপনার হৃদয়ের সমগ্র ইচ্ছা এক ভগবদিচ্ছার নিকট বলিদান করিলেন। আমার ঈশ্বর আমার বাড়ীতে আসেন, আমার বিরোধীর বাড়ীতে যান না, এ কথা তিনি জানিতেন না। এইরূপে তিনি সকলের সঙ্গে একহৃদয় হইলেন, সমুদায়

বিরোধী ভাবকে এক করিলেন। (পাপবোধ হইতে দীনতা, দীনতা হইতে ঈশ্বরাধীনতা, ঈশ্বরাধীনতা হইতে আমিত্ববিদায় তাঁহাতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার জনসমাজের সঙ্গে সকল ভাবের সঙ্গে একত্ব হইবার কোন বিঘ্ন রহিল না, অথচ ঈশ্বরের ইচ্ছানুগতত্ববশতঃ তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলেন, আপনার নিয়ামক আপনি হইলেন। কোন কোন বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেশবচন্দ্র Utopia (আকাশ-কুসুম) প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যদি তাহা না হইবে, নববিধানমণ্ডলী মধ্যে বিরোধের অগ্নি জ্বলিল কেন? কোথায় সকলের একত্র মিলন, না কোথায় এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে প্রবৃত্ত। আমাদিগের অযোগ্যতায় আমাদিগের বন্ধুর নাম কলঙ্কিত হইল। আমাদিগের ন্যায় সামান্য ঘৃণিত কলঙ্কিত লোকের মস্তকে আরও ঘৃণা ও অবমাননাসূচক বাক্যবাণ পতিত হউক, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের বন্ধুর নাম কলঙ্কিত হইবার নহে। চারি দিক্ অন্ধকারাবৃত হইয়াছে, এই অন্ধকারের ভিতর উহা আরও উজ্জ্বল হইবে। আমাদিগের আমিত্ব যখন যায় নাই, তখন নববিধানের এ মহাভাব আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইবে কি প্রকারে? যত দিন আমাদের আমিত্ব যায় নাই, তত দিন এই আমিত্ববোধে মণ্ডলীর সর্ব্বনাশ হইবে। আমিত্ব যেখানে, নববিধানের মণ্ডলী সেখানে নাই। যেখানে কেহ কাহাকেও মানে না, কাহারও ভিতরে ঈশ্বরের লীলা দেখে না—তাঁহার কথা শুনে না, আপনার প্রতি ভিন্ন অপরের প্রতি

আদর নাই, সেখানে নববিধান নাই। কেশবচন্দ্র আমিত্ববর্জ্জিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাতে সমুদায়ের একত্ব সম্ভবপর হইয়াছিল। যদি কেহ তাঁহার ধর্ম্মকে 'ইউটোপিয়া' বলেন, ঈশা চৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম্মকেও 'ইউটোপিয়া' বলিতে হইবে। ঈশা যে জন্য প্রাণ দিয়াছেন, চৈতন্য পথের ভিখারী হইয়াছেন, শাক্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহা কখন 'ইউটোপিয়া' হইতে পারে না। আপনার ইচ্ছাকে সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করা কি 'ইউটোপিয়া'? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম মিথ্যা, সাধন ভজন মিথ্যা, সর্ব্বসংশয়বাদ সত্য। নববিধান কি চান? আত্ম ইচ্ছার বলিদান চান। আত্ম ইচ্ছা বলিদান তো পুরাতন বিধান; উহাতে আর নূতনত্ব কি? নূতনত্ব প্রতিজনের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ। ঈশ্বরের বাণীশ্রবণ করিয়া চলাতে এখানে আমিত্বের বিনাশ। এই আমিত্ববিনাশে সার্ব্বভৌমিক ও বিশেষ প্রতিসাধকে একীভূত হইবে, এক ঈশ্বর ও এক মানবের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, সমুদায় ভিন্নতা বোধ তিরোহিত হইয়া যাইবে। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, সকল বিধান, সকল শাস্ত্র, সকল মহাজন, এক অখণ্ড সার্ব্বভৌমিক পরব্রহ্মের বিবিধপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হইয়া সকল বিরোধ অপসারিত হইবে। ইহা হইবেই হইবে, কেন না যখন এক জীবনে হইয়াছে, তখন উহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ কৃপা করিয়া সকলের হৃদয় বিশেষ ও সার্ব্বভৌমিকের মিলনস্থান করুন।